বঙ্কিমচন্দ্র ও অসমিয়া সাহিত্য

বাসুদেব দাস

ভাষাগত ও সাংস্কৃতিকগত দিক থেকে অসম ও বাংলার মধ্যে ভারতীয় অন্যান্য ভাষার তুলনায় অধিক নৈকট্যের ফলে এই দুটি প্রতিবেশী রাজ্যের মানুষ ও তাদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে একটি নিবিড় সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। তাই স্বাভাবিকভাবেই বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাব অসমিয়া জনমানসে বর্তমান। আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় 'বঙ্কিমচন্দ্র ও অসমিয়া সাহিত্য'। মাইকেল মধুসূদনকে কেন্দ্র করে যেমন অসমিয়া কবিতায় নবজীবনের সূত্রপাত হয়েছিল তেমনই অসমিয়া গদ্যসাহিত্যে, বিশেষ করে উপন্যাস রচনার আদিপূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন আদর্শ পুরুষ। ইংরেজ ঔপন্যাসিক স্যার ওয়ালটার স্কট ও বাংলার সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রকে আদর্শ রেখেই পদ্মনাথ গোহাঞিবরুয়া ,রজনীকান্ত বরদলৈ অসমিয়া ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার সূত্রপাত করেন। আনন্দমঠ উপন্যাসের 'বন্দেমাতরম 'মন্ত্র একদিন বাংলা এবং ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মতোই অসমের আকাশ বাতাসকেও মুখরিত করে তুলেছিল । সমসাময়িক নাটক ,কবিতা ,গান এবং কথাসাহিত্যে ঘটেছিল তার প্রতিফলন। কমলাকান্তের অনুষঙ্গে সাহিত্য রথী লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া রচনা করেছিলেন 'কৃপাবর বরুয়া' চরিত্র । আমাদের আলোচনার সীমিত পরিসরে এই সমস্ত কিছুই সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনার ইচ্ছা রইল। তবে মূল আলোচনায় প্রবেশ করার আগে তৎকালীন অসমের সামাজিক,রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি তুলে ধরার চেষ্টা করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

উনবিংশ শতকে অসম এবং বাংলার পরিস্থিতি একরকম ছিল না। ১৮২৬ সনের ২৪ ফেব্রুয়ারি ইয়াণ্ডাবুর সন্ধির ফলে অসমে ব্রিটিশ রাজত্বের সূত্রপাত হয়। তার প্রায় সত্তর বছর আগে পলাশির যুদ্ধে জয়লাভের ফলে বঙ্গদেশে ইংরেজ শাসনের সূত্রপাত হয়। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা- সংস্কৃতির দরজা বঙ্গের মানুষের কাছে ইংরেজ শাসনের সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে খুলে গিয়েছিল। ফলে স্বাভাবিকভাবেই অসমের সঙ্গে বঙ্গের রাজনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থার অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ১৮২৬ সনে অসমে ইংরেজ শাসনের কেবল সূত্রপাত হয়। এই বছরেই আধুনিক বঙ্গের কিম্বদন্তী পুরুষ হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-৩১) ইতিহাসের অধ্যাপকরূপে কলকাতার হিন্দু কলেজে যোগদান করেন। প্রথমদিকে (১৮১৭-২৬) কেরানি উৎপাদকের কারখানা হলেও বঙ্গের উনবিংশ শতকীয় সমাজে হিন্দু কলেজের অবদানকে অস্বীকার করা যায় না।

১৮১৮ সনে বঙ্গে সাময়িক পত্রিকার প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই বছর ২৩ মে জে.সি মার্সম্যানের সম্পাদনায় 'সমাচার দর্পণ' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। বঙ্গের সমাজ জীবনে এটি ছিল আশীর্বাদ স্বরূপ। প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয় ছাড়াও পত্রিটিতে প্রকাশিত ইংলাণ্ড এবং ইউরোপ সংক্রান্ত সংবাদ ,বাণিজ্যাদির বিবরণ,ভারতের প্রাচীন ইতিহাস,বিদ্যা-বিদ্বান এবং নানারকম গ্রন্থাদির বিবরণ বাঙ্গালির মনোজগতে বেশ আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল।

বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসের অনেক বিষয় ,যেমন সতী-দাহ,বিধবা-বিবাহ,বহু-বিবাহ ইত্যাদির পক্ষে বিপক্ষে সংঘটিত আলোড়ন এবং রায়তের উপর জমিদারের নির্যাতন বা ব্রাহ্মধর্ম উনবিংশ শতকের অসমের সমাজ জীবনে অনুপস্থিত। দেশীয় ভাষার বিপর্যয় বিষয়েও অসম এবং বঙ্গের মধ্যে কোনো ধরনের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় না। যে সময়ে অসমে অসমিয়ারা নিজেদের ভাষা ও সাহিত্ব চর্চা থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত ছিল (১৮৩৬--১৮৭২) ,তারও অনেক আগে থেকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ এবং শ্রীরামপুর মিশনের উদ্যোগে বঙ্গে বাংলাভাষায় গ্রন্থ রচিত এবং প্রকাশিত হয়ে আসছিল। উইলিয়ম কেরী , মার্শম্যান এবং অন্যান্য ইউরোপীয় ধর্মপ্রচারকরা নিজেদের রচিত বা পণ্ডিতদের দ্বারা প্রণয়ণ করা বিভিন্ন বিষয়ের বাংলা পাঠ্যপুঁথি এই শতকের গোড়াতেই প্রকাশিত হয়েছিল।

অসমিয়া ভাষার গদ্য বাংলা গদ্যের চেয়ে কয়েক শত বছরের পুরোনো হওয়া সত্ত্বেও এই শতকের প্রথমদিকে সংঘটিত ভাষিক বিপর্যয়ের ফলে অসমিয়া গদ্য আধুনিক রূপ লাভ করায় অনেক দেরি হয়ে যায়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিলেত থেকে আগত সিভিলিয়ান কর্মচারিদের বাংলা শেখানোর প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় বাংলা ভাষার অভিধান,ব্যাকরণ ইত্যাদি গ্রন্থের প্রকাশ সম্ভব হয়ে উঠে। অপরদিকে এই শতিকার দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত অসমিয়া ভাষায় গ্রন্থ প্রকাশের তেমন কোনো উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায় না। তার কারণ অবশ্য অষ্টম দশক পর্যন্ত অসমের সরকারি ভাষা হিসেবে অসমিয়া ভাষার পরিবর্তে বাংলা ভাষার প্রচলন।

অবস্থার এই বৈপরীত্য এবং সামাজিক পরিস্থিতির এই বৈসাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও বঙ্গের সামাজিক জীবনের প্রভাব উনবিংশ শতকের অসমের উপর অনিবার্যভাবেই পড়েছিল। উনিশ শতকের শুরু থেকেই এই প্রভাবের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন (১৮০২-৩২),যজ্ঞরাম খারঘরীয়া ফুকন (১৮০৫--৩৮),যদুরাম ডেকা বরুয়া (১৮০১-৬৯),মণিরাম

দেওয়ানের (১৮০৬-৫৮) মাধ্যমে বঙ্গের প্রভাব অসমিয়া জীবন যাত্রাকে স্পর্শ করল। এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন 'আসাম দেশীয় অতি মান্য লোক'। 'সমাচার দর্পণ','সমাচার চন্দ্রিকা','সম্বাদ প্রভাকর','বঙ্গদূত'ইত্যাদি বাংলা সংবাদপত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে বঙ্গের নতুন ধ্যান-ধারণা এবং সমাজ চেতনার ধারাটিকে এঁরা অসমে বহন করে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা কেবলমাত্র বাংলা সংবাদপত্রের গ্রাহক বা পাঠকই ছিলেন না ,লেখক এবং অসমের সংবাদ প্রেরক ও ছিলেন। বাংলা সংবাদপত্রের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগের ফলে তাঁদের মন হয়ে উঠেছিল কলকাতামুখি ,মানসিকভাবে তাঁরা মোটামুটি কলকাতাতেই বাস করতেন।

বাংলা ভাষায় অসমের বুরঞ্জী (ইতিহাস) এবং কামরূপের যাত্রা পদ্ধতির প্রণেতা হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকনের চিঠি-পত্র, যজ্ঞরামের করা ইংরেজি কবিতার বাংলা অনুবাদ ,মণিরাম দেওয়ানের সম্পাদকের কাছে লেখা চিঠি সমকালীন বাংলা সংবাদ পত্রে একদিকে যেমন অসমিয়া মনীষার পরিচায়ক তেমনই অন্যদিক দিয়ে বঙ্গ -অসমের সংস্কৃতির সংযোগকারকও । স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে হলিরামের উদ্যমশীলতা,বিধবা-বিবাহ সম্পাদনে যজ্ঞরামের অগ্রসরতা,বাংলা অসমিয়া অভিধান প্রণয়নে যদুরামের আত্মমগ্নতা এবং অসমের সামাজিক সংস্কৃতির ইতিহাস কথনে মণিরামের স্বদেশপ্রাণতা এই সবকিছুর মূলেই অসমের প্রতিবেশী বঙ্গ এবং ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতার প্রভাব বর্তমান।

অসমের শিক্ষিত সমাজের অগ্রণী অংশের চিন্তা-চর্চায় বঙ্গীয় নবজাগরণের প্রভাব কীভাবে এবং কতদূর কার্যকরী হয়েছিল ,সেই বিষয়ে ইতিমধ্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ,গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে। বিশিষ্ট গবেষক অমলেন্দু গুহ রচিত 'The Impact of Bengal Renaissance' শীর্ষক প্রবন্ধটি সম্ভবতঃ এই বিষয়ে সবচেয়ে মূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ রচনা।[৩] মননশীল লেখক হীরেন গোঁহাই তাঁর একাধিক প্রবন্ধে এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন।

১৮৮৮ সনের ২৫ আগস্ট জন্মাস্টমির দিন কলকাতার ৬৭ নং মীর্জাপুর স্ট্রিটে প্রবাসী অসমিয়া ছাত্রদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় 'অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা'। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া,চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা,হেমচন্দ্র গোস্বামী,রজনীকান্ত বরদলৈ,রাধানাথ ফুকন,ঘনশ্যাম বরুয়া,চন্দ্রধর বরুয়া,কমলচন্দ্র শর্মা,যজ্ঞেশ্বর শর্মা নিয়োগ ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ১৮৮৯ সনের ১৩ জানুয়ারি সভার মুখপত্র 'জোনাকী' প্রকাশিত হয়। মূলত চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা,লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া, এবং হেমচন্দ্র গোস্বামীর পরিচালনাতেই. 'জোনাকীর' জয়যাত্রা শুরু হয়। 'জোনাকী'র প্রকাশক,সম্পাদক এবং সত্ত্বাধিকারী ছিলেন যুবক চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা।

অসমিয়া সাহিত্যের প্রথম ঔপন্যাসিক পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়া। তাঁর রচিত উপন্যাসের সংখ্যা দুটি। এই দুটি উপন্যাসই ইতিহাসের পটভূমিতে রচিত। পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়া শিবসাগরের স্কুলে পড়ার সময় থেকেই 'জোনাকী' পত্রিকার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কলকাতার ১৪ নং প্রতাপচন্দ্র চ্যাটার্জী লেনের মেসবাড়িতে থাকার সময় পদ্মনাথ গোহাঞিবরুয়া সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখার সুযোগ লাভ করেন। এই দর্শনের অপূর্ব স্মৃতি তিনি তাঁর 'মোর সোঁৱরণী' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। কলেজস্ট্রীটের উত্তর দিকে মেডিকেল কলেজের প্রকাণ্ড পাকা বাড়ি,দক্ষিণদিকের দোতলা একটি বাড়িতে অসমিয়া ছাত্ররা বাড়ি ভাড়া করে থাকতেন। প্রতিদিন সকালবেলা প্রতিভাশালী বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখার সুযোগকে পদ্মনাথ গোহাঞিবরুয়া পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তখন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। প্রতিদিন সকাল দশটায় আদালতে যাবার উদ্দেশ্যে বঙ্কিমচন্দ্র পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়া দেবের মেসবাড়ির নিচে দাঁড়িয়ে তাঁর ঘোড়ায় টানা গাড়ির অপেক্ষা করতেন। গোহাঞিবরুয়া সেই সুযোগে প্রাণভরে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখে নিতেন। বলাবাহুল্য সাহিত্য সম্রাটের গম্ভীর ব্যক্তিত্ব গোহাঞিবরুয়াকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তিনি বলেছেন যে সেই সময় তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য আর প্রবন্ধের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি আরও বলেছেন যে বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই তিনি 'রবিবাবুর' কবিতা পড়ায় এই সময় খুব মনোযোগী হয়ে উঠেছিলেন। বঙ্কিমবাবুকে প্রতিদিন অযাচিত দর্শন করার মতোই সেকালের নবীন কবি 'রবিবাবুর' দেখা পাওয়ার জন্যও সুযোগের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতেন। কোথাও রবিবাবুর কোনো অনুষ্ঠান থাকলেই গোহাঞিবরুয়া আগেভাগেই সেখানে গিয়ে উপস্থিত হতেন। এভাবেই মাঝেমধ্যে বিরাট পুরুষ বিদ্যাসাগরের পেছন পেছন নীরবে অনুসরণ করে যেতেন। বিদ্যাসাগরী চটির শব্দে রাস্তা মুখরিত করে সামনে এগিয়ে চলেছেন সেই বিরাট পুরুষ ,পেছনে নীরবে অনুসরণ করে চলেছেন পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়া। দৃশ্যটি ভাবতেও আমাদের মনে রোমাঞ্চ জাগে।

১৮৯০ সাল পর্যন্ত অসমিয়া ভাষায় উপন্যাস বলতে কিছু ছিল না। পদ্মনাথ গোহাঞিবরুয়া উনিশ বছর বয়সে স্যার ওয়ালটার স্কট এবং সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণে 'ভানুমতী' রচনা করেন। ১৮৯১ সালে গোহাঞিবরুয়া কলকাতায় 'বিজুলী' পত্রিকার সম্পাদক থাকা অবস্থায় এটি ধারাবাহিকভাবে বিজুলীতে প্রকাশিত হয়। ১৯০৮ সনে এটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত

হয়। উপন্যাসটির বিষয়বস্তু প্রণয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই এর প্রধান অবলম্বন রোমান্স। উপন্যাসের কাহিনি উপস্থাপিত হয়েছে মোয়ামরীয়া বিদ্রোহের পটভূমিতে। ইতিহাসের পটভূমিতে এর কাহিনি গড়ে ডঠেছে। পিতৃমাতৃহীন চারু গোহাঞি মরাণ গোহাঞি বরুয়ার ঘরে প্রতিপালিত হয়। শৈশব থেকেই একসঙ্গে প্রতিপালিত হওয়ায় মরাণ গোহাঞির সুন্দরী কন্যা ভানুমতীর সঙ্গে চারুর প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে উঠে। ইতিমধ্যে রাজকুমারের সঙ্গে ভানুমতীর বিয়ের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ভানুমতী একথা জানতে পেরে পুরুষের ছদ্মবেশে পালিয়ে গিয়ে এক বুড়ির বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেখানেই সে মোয়মরীয়া বিদ্রোহের কথা জানতে পারে। রাজা শিবসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করার সময় রাণী ফুলেশ্বরী (ঔপন্যাসিকের মতে অম্বিকা দেবী) মোয়ামরীয়াদের অপমান করে। মেয়ামরীয়া মহন্তরা এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ খুঁজতে থাকে এবং বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ভানুমতী এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে। একদিন মাছ ধরতে গিয়ে সর্পদংশনের ফলে ভানুমতীর পুরুষের ছদ্মবেশ প্রকাশিত হয়ে পড়ে। ভানুমতী রাজার বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখান করায় নানারকম অত্যাচারের সম্মুখিন হয়। রাজার কোপদৃষ্টিতে পড়ে চারু গোহাঞিও বন্দীত্ব লাভ করেন। তরা আইদেউর সহায়তায় ভানুমতী চারু গোহাঞিকে বন্দিশালা থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে। তবে চারু গোহাঞি পালিয়ে যেতে প্রস্তুত না হওয়ায় ভানুমতীর সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। শোকে দুঃখে জর্জরিতা ভানুমতী জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। সংক্ষেপে এই হল 'ভানুমতীর কাহিনি।

'ভানুমতী'কে সামাজিক উপন্যাস হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। কারণ ইতিহাসের ঘটনা এর কাহিনি বিকাশে কোনোরকম সাহায্য করেনি। ইতিহাসের সঙ্গে এর যোগসূত্র খুবই ক্ষীণ। রাজা শিবসিংহকে প্রণয়ে লিপ্ত করা হলেও এর কোনো ঐতিহাসিক সত্যতা নেই। কাল্পনিক একটি ঘটনার সঙ্গে ঐতিহাসিক চরিত্র শিবসিংহকে জড়িত করা হয়েছে মাত্র। মোয়ামরীয়া বিদ্রোহের পটভূমিতে এর কাহিনিকে স্থাপন করা হলেও বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কোনো প্রভাব আমরা এর কাহিনিতে লক্ষ্য করি না। মূল কাহিনিতে দুটো প্রণয়ের ত্রিভুজ অঙ্কন করা হয়েছে। প্রথমটিতে রয়েছে ,দজন পুরুষ এবং একজন নারী। চারু গোহাঞি এবং রাজা শিবসিংহ উভয়েই ভানুমতীর পাণিপ্রার্থী। অন্যটিতে রয়েছে ,দুটি নারী এবং একটি পুরুষ। ভানুমতী এবং তরা আইদেউ উভয়েই চারু গোহাঞিকে মনে প্রাণে কামনা করেছে। এই দুটি ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টির যথেষ্ট সুযোগ ছিল। কিন্তু ঔপন্যাসিক সে সুযোগ গ্রহণ করেন নি। চারু গোহাঞি চরিত্রের নিষ্ক্রিয়তা উপন্যাসের কাহিনি ঘনীভূত হয়ে উঠায় এবং তার চরিত্রে অর্ন্তদ্বন্দ্ব সৃষ্টির বাধাস্বরূপ হয়ে উঠেছে। তবে এক্ষেত্রে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ যোগ্য। আমরা জানি গোহাঞিবরুয়া কলকাতা থাকাকালীন সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস গুলি খবু মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সমাজ বহির্ভূত প্রেমকে কোনো দিন সাহিত্যে স্বীকৃতি দেন নি। কবিসত্তা থেকেও তার নৈয়ায়িক সত্তা ছিল খুবই প্রখর। তাই তিল তিল করে গড়ে তোলা কুন্দ নন্দিনীকে শেষ পর্যন্ত অকালে ঝরে পড়তে হয়, গোবিন্দলালের হাতে রোহিনী খুন হয়,শৈবলিনী শেষপর্যন্ত পাগল হয়ে যায়। অসমিয়া সমাজের রীতি-নীতি,আচার ব্যবহারের প্রতি গোহাঞি বরুয়ার আনুগত্য ছিল অত্যন্ত গভীর। প্রণয়ের ক্ষেত্রে সম্ভ্রান্ত ঘরের যুবক যুবতিরা সামাজিক বাধা নিষেধকে অতিক্রম করে যাবে বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই রক্ষণশীল পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়া এটাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারেন নি । তাই কুন্দ নন্দিনী বা রোহিনীর মতোই ভানুমতীকে অকালে প্রাণ দিতে হয়।

অতীতের স্বপ্নময় বর্ণনা এবং চরিত্রের বীরত্ব সূচক কার্য ঐতিহাসিক উপন্যাসে যে রোমান্সের পরিবেশ গড়ে তোলে তা আমরা গোহাঞি বরুয়ার উপন্যাসে দেখতে পাই না। উপন্যাসটিতে রোমান্স সৃষ্টির একমাত্র অবকাশ ছিল ভানুমতী চারু গোহাঞির প্রণয়কে অবলম্বন করে । কিন্তু চারু গোহাঞির চরিত্রে কোনো সক্রিয়তা না থাকায় রোমান্সের পরিবেশ ঘনীভূত হয়ে উঠতে পারে নি। ভানুমতীর পুরুষ চরিত্রের বেশ ধারণ আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ উপন্যাসের শান্তি চরিত্রের কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

পদ্মনাথ গোহাঞিবরুয়ার দ্বিতীয় উপন্যাস 'লাহরী' ১৮৯২ সনে প্রকাশিত হয়। পটভূমি মানের দিনের একেবারে শেষের দিকের সময় সীমা। ভানুমতীর মতোই এর সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্ক খুবই ক্ষীণ। মানের অত্যাচারে জনসাধারণের জীবন কীভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল তার একটা আভাস দেওয়ার প্রয়াস উপন্যাসটিতে লক্ষ্য করা যায়। সমাজের বিভিন্ন স্তরের নর নারীর জীবনধারা গোহাঞিবরুয়ার উপন্যাসে সজীবতা লাভ করতে পারে নি। স্যার ওয়ালটার স্কটের উপন্যাসে যেভাবে স্কটল্যাণ্ডের জনশ্রুতি ,কিম্বদন্তী ইত্যাদি সন্নিবিষ্ট হওয়া ছাড়াও সমাজের ছোট বড় সমস্ত শ্রেণিই জীবন্ত হয়ে উঠেছে ,গোহাঞি বরুয়ার উপন্যাসে তা পরিলক্ষিত হয় না। গোহাঞিবরুয়ার পরবর্তী ঔপন্যাসিক রজনীকান্ত বরদলৈর উপন্যাসে বরং পুরোনো অসমিয়া সমাজের প্রতিচ্ছবি নিঁখুত ভাবে ফুটে উঠতে দেখা যায়।

অসমিয়া ঐতিহাসিক উপন্যাস রজনীকান্ত বরদলৈর হাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। 'দন্দুয়াদ্রোহ' নামক উপন্যাসের

ভূমিকায় রজনীকান্ত বরদলৈ বলেছেন --'কলেজে পড়ার সময় স্যার ওয়ালটার স্কট এবং সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পড়েছিলাম। আমাদের অসমের সমস্ত নদী নালা ,ঝর্ণা,বিল ,পুকুর,পাহাড় স্কটের সেই হাইল্যাণ্ড ,লো ল্যাণ্ডের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। হায় ,আমার অসম জননী । তুমি প্রকৃতির কাম্য কানন। তোমার কোলে স্কটল্যাণ্ডের সমস্ত প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যই বর্তমান। তোমার অতীত ইতিহাস নানা ঘটনায় পরিপূর্ণ। কিন্তু তোমার এই সমস্ত স্বাভাবিক সৌন্দর্য বর্ণনা করার জন্য স্যার ওয়ালটার স্কটের মতো বা বঙ্কিমচন্দ্রের মতো প্রতিভাবান ঔপন্যাসিক কোথায়? '

স্যার ওয়ালটার স্কট এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই বরদলৈর উপন্যাসও রোমান্সপ্রধান। কাহিনির উপকরণের খোঁজে বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই বরদলৈ অতীতের দিকে ফিরে তাকিয়েছিলেন। তবে অতীতের কাল্পনিক বর্ণনার সাহায্যে রোমান্স সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়ে রজনীকান্ত বরদলৈর সুবিধে কম ছিল। বরদলৈর ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার মূলে ছিল অতীত অসমের গৌরবোজ্জ্বল কাহিনি উদ্ধার করে অসমিয়া জনমানসে প্রাণসঞ্চার করা। এর জন্য তিনি মানের আক্রমণকেই উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। অসম ইতিহাসের এই ঘটনা খুব বেশি প্রাচীন নয় বলে কল্পনার আশ্রয় নিতে গিয়ে বরদলৈকে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই বরদলৈর উপন্যাসে রোমান্সের রস পরিবেশিত হয়েছে প্রধানত প্রণয় কাহিনির মাধ্যমে। 'মনোমতী' উপন্যাসের মূল কাহিনি মনোমতী এবং লক্ষ্মীকান্তে র প্রণয়। 'রঙ্গিলী'তে সৎরাম এবং রঙ্গিলী ,'রহদৈ লিগিরী'তে রহদৈ এবং দয়ারাম,'নির্মল ভকত' এ নির্মল এবং রূপহী এবং 'তাম্রেশ্বরী মন্দির' উপন্যাসে আঘোণী এবং ধনেশ্বরের প্রণয় উপাখ্যান প্রাধান্য লাভ করেছে।

নায়িকার রূপ বিশ্লেষণ বরদলৈর উপন্যাসে রোমান্স সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে। রূপ বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রায়ই উপমা প্রয়োগ করেছেন। কোনো উপমা প্রাচীন সাহিত্য থেকে গৃহীত,আবার কোনো কোনো উপমা লেখকের অপূর্ব কবি দৃষ্টির পরিচয়বাহী। রূপবর্ণনার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃতি চেতনারও পরিচয় ফুটে উঠেছে। দুর্গেশনন্দিনীর দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে আয়েষার রূপের বর্ণনা দেখতে পাই প্রায় আড়াইশত শব্দের একটি মাত্র চরণে আয়েষার রূপ বর্ণিত হয়েছে। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে রোহিণীর রূপ বর্ণনায় লেখকের আশ্চর্য সংযম লক্ষ্য করা যায়। --'রোহিণীর যৌবন পরিপূর্ণ --রূপে উথলিয়া পড়িতেছিল--শরতের চন্দ্র ষোলকলায় পরিপূর্ণ।' নারীর সহজ ,সরল এবং কল্যাণময়ী রপটিই আমরা বরদলৈর উপন্যাসে প্রত্যক্ষ করি। বিষবৃক্ষ উপন্যাসের 'হীরা'র ন্যায় কুটিল চরিত্র আমরা বরদলৈর উপন্যাসে পাই না। এদিক দিয়ে আমরা বলতে পারি বরদলৈর নারী চরিত্র বরং সূর্যমুখিকে অনুসরণ করেছে। আরও একটি দিক দিয়ে বরদলৈর নারী চরিত্রগুলি বঙ্কিম অনুসারী। উপন্যাসের কাহিনিতে পুরুষ অপেক্ষা নারী চরিত্র অনেক বেশি প্রাধান্য লাভ করেছে। কোনো কোনো উপন্যাসে নায়িকার সক্রিয়তা নায়ককে নিষ্প্রভ করে তুলেছে। 'রঙ্গিলী' উপন্যাসে রঙ্গিলীর সজীবতা এবং 'রহদৈ লিগীরী'উপন্যাসে রহদৈর ভূমিকার কাছে অন্যান্য চরিত্রগুলো ম্লান হয়ে পড়েছে। এই জন্যই কোনো কোনো সমালোচক বলেন যে রজনীকান্ত বরদলৈর উপন্যাসে নায়িকা আছে ,নায়ক নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের পুরুষ চরিত্রগুলো সম্পর্কেও অনেক সমালোচক এই প্রশ্ন তুলেছেন। নগেন্দ্রনাথ,দেবেন্দ্র ,নবকুমার, প্রতাপ,গোবিন্দলাল অপেক্ষা তুলনামূলকভাবে সূর্যমুখী ,কুন্দনন্দিনী,হীরা ,কপালকুণ্ডলা,শৈবলিনী বা রোহিনীর চরিত্র অনেকাংশেই উজ্জ্বল নয় কি ?

বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত রচনার পশ্চাতেই একটা সমাজ কল্যাণ মূলক মনোভাব বিদ্যমান। শিল্পের জন্যই শিল্প নীতিতে তিনি খুব একটা বিশ্বাসী ছিলেন না বলিয়া মনে হয়। 'বাঙ্গালা নব্য লেখকদিগের প্রতি ' শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন --'যদি এমন বুঝিতে পারেন যে ,লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন ,অথবা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন ,তবে অবশ্য লিখিবেন। ' রজনীকান্ত বরদলৈর উপন্যাস রচনার পশ্চাতেও এমন একটি উদ্দেশ্য লক্ষ করা যায়। একটা বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বরদলৈ ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় হাত দিয়েছিলেন বলে রচনার কলাত্মক দিকটির প্রতি তিনি সেভাবে নজর দিতে পারেন নি। বরদলৈ বলেছেন যে তিনি উপন্যাস রচনায় হাত দিয়েছেন মানুষের মনে আধ্যাত্মিক ভাবের জাগরণ ঘটানোর জন্য। বরদলৈর উপন্যাসে আমরা তাই লক্ষ্য করি নানা দুঃখ দুর্দশার শেষে শান্তির পথ হিসেবে নায়ক নায়িকারা শেষ পর্যন্ত বৈষ্ণব ধর্মের শরণে এসেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে স্বপ্নের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। বিষবৃক্ষ উপন্যাসের তৃতীয় পরিচ্ছদে কুন্দনন্দিনীকে স্বপ্নদর্শনের মাধ্যমে সাবধান করা হয়েছে। স্বপ্নের মধ্যে কুন্দনন্দিনীর মৃতা মা দুটি মনুষ্যমূর্তি দেখিয়ে কুন্দনন্দিনীকে তাদের থেকে সর্বতোভাবে দূরে থাকতে বলেছে। এই মনুষ্যমূর্তিদ্বয়ের একজন নগেন্দ্রনাথ ,অপরজন হীরা। উপন্যাসের পরবর্তী অংশে আমরা দেখেছি কুন্দনন্দিনীর জীবনে যে সর্বনাশা করুণ পরিণতি ঘনিয়ে এসেছে তার মূলে রয়েছে স্বপ্নে বর্ণিত এই দুই মনুষ্যমূর্তির

সংস্পর্শ। শুধু স্বপ্ন নয় অতিপ্রাকৃত ঘটনাবলীও বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্রদের জীবনে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে। কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের নবম পরিচ্ছেদে আমরা দেখি নবকুমারের সঙ্গে কাপালিকের আশ্রয় ত্যাগ করে চলে আসার সময় কপালকুণ্ডলা তাঁর আরাধ্য দেবী কালীমূর্তিকে প্রণাম করার সময় দেবীর পায়ে পুষ্পপাত্র থেকে অভিন্ন বেল পাতা নিয়ে স্থাপন করে। কপালকুণ্ডলা সভয়ে লক্ষ্য করে যে বিল্বপত্রটি দেবীর পা থেকে পড়ে যায়। তার কেমন যেন দৃঢ় বিশ্বাস হয় এর মধ্যে অমঙ্গলের চিহ্ন রয়েছে। রজনীকান্ত বরদলৈ উপন্যাসের মধ্যেও আমরা স্বপ্নের একটি বিশেষ ভূমিকা লক্ষ্য করি। স্বপ্নের সাহায্যে অনেক সময় লেখক আসন্ন বিপদ বা নায়ক নায়িকার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার ইঙ্গিত দান করেছেন। কিছু কিছু জায়গায় স্বপ্নের সাহায্যে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের খবরও দেওয়া হয়েছে। 'রঙ্গিলী','রহদৈ লিগিরী','নির্মল ভকত','তাম্রেশ্বরী মন্দির' ইত্যাদি উপন্যাসে স্বপ্নের সমাবেশ লক্ষ্য করার মতো। 'রঙ্গিলী' উপন্যাসে রঙ্গিলী প্রেমিক সৎরামকে তাঁর স্বপ্ন দেখার কথা বলেছে। সে স্বপ্ন দেখে রাজার ঘরে আগুন লেগেছে। সেই আগুনের কবলে পড়ে মানুষ দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে সেই আগুনের লেলিহান শিখা সমস্ত অসমকে গ্রাস করে ফেলেছে। সৎরাম অবশ্য এই স্বপ্নে খুব একটা গুরুত্ব দিতে চায়নি। সে মনে করে স্বপ্ন মস্তিষ্কের ভ্রান্তি মাত্র। 'মনোমতী' উপন্যাসে কমল আতৈ পশ্চিম আকাশে আগুন জ্বলে উঠতে দেখা স্বপ্ন ,স্বর্গ থেকে মা নেমে এসে পদুমীকে নিয়ে যেতে দেখা স্বপ্ন খুবই তাৎপর্যমূলক। 'মিরী জীয়রী' উপন্যাসে পানেই জংকীর হাত ধরে ঘুরে বেড়ানো ,নৌকা বাওয়া ,বিহু নাচে অংশগ্রহণ করা স্বপ্নে দেখতে পেয়েছিল। 'তাম্রেশ্বরী' উপন্যাসেও আমরা ধনেশ্বরের স্বপ্ন দেখার কথা জানতে পারি। বরদলৈর উপন্যাসে এইভাবে অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিকতার সমাবেশ উপন্যাসের রূপ বা সাহিত্যিক সৌন্দর্যের কোনোরকম ক্ষতি না করে বরং একটা আকর্ষণীয় রূপ লাভ করেছে ।

'মিরী -জীয়রী' উপন্যাসের উপসংহার আমাদের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই রজনীকান্ত বরদলৈ এখানে ঔপন্যাসিকের নৈর্ব্যক্তিকতা বজায় রাখতে পারেন নি। 'বিষবৃক্ষ ' উপন্যাসের শেষে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন 'আমরা বিষবৃক্ষ' সমাপ্ত করিলাম ,ভরসা করি ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত ফল ফলিবে।' নৈয়ায়িক বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে এভাবেই সেদিন কবি বঙ্কিমচন্দ্রের পরাজয় হওয়ায় সাহিত্য রস ক্ষুন্ন হয়েছিল। 'মিরী- জীয়রী' উপন্যাসেও লেখকের বিরুদ্ধে এই একই অভিযোগ উঠতে দেখা যায়। উপসংহারে যেন বঙ্কিমচন্দ্রকে হবহু অনুকরণ করে রজনীকান্ত বরদলৈ বলেছেন--'আমার হতভাগিনী মিরি-জীয়রীর দুখ লগা কাহিনী খতম করিলো । আশা করো ইয়াতে এতিয়ার পরা মিরির ঘরে ঘরে সুফল ফলিব। (আমাদের হতভাগিনী মিরী-জীয়রীর কাহিনি শেষ করলাম । আশা করি এর ফলে এখন থেকে মিরির ঘরে ঘরে সুফল ফলবে।)

এবার আমরা অসমিয়া সাহিত্য ও সমাজে 'কমলাকান্তের দপ্তর' ও 'বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম মন্ত্রের প্রভাব সম্পর্কে দু-একটি কথা বলতে চেষ্টা করব। 'কমলাকান্তের দপ্তর' গ্রন্থের কমলাকান্তের অনুসরণে সাহিত্যরথী লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া কৃপাবর বরবরুয়ার চরিত্র সৃষ্টি করেন। ঠাকুরপরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে জড়িত লক্ষ্মীনাথ তৎকালীন বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন --'বঙ্কিম সর্বপ্রথমে হাস্যরসকে সাহিত্যের উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত করেন। তিনিই প্রথমে দেখাইয়া দেন যে ,কেবল প্রহসনের সীমার মধ্যে হাস্যরস বন্ধ নহে,উজ্জ্বল শুভ্র হাস্য সকল বিষয়কেই আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে।'লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার সৃষ্ট কৃপাবর বরবরুয়ার 'কাকতর টোপোলা', 'ওভতনি' ,বরবরুয়ার ভাবর বুরবুরনি',বরবরুয়ার বুলনি' র অন্তর্গত প্রবন্ধগুলো সম্পর্কেও অসমিয়া সাহিত্যে ঠিক এই কথাটিই প্রযোজ্য বলা যেতে পারে। রাজনীতি নিয়ে রচিত প্রবন্ধগুলোর মধ্যে ভারত উদ্ধার,বরবরুয়ার রাজনীতি,বন্দেমাতরম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত রচনায় নির্মল হাস্যরসের অবতারণা করা হয়েছে। বেজবরুয়ার হাস্যরসাত্মক প্রবন্ধগুলিতে ভারত এবং অসমের রাজনৈতিক চেতনা,শাসনতন্ত্রের দুর্ভেদ্যতা,সাংস্কৃতিক ত্রুটি বিচ্যুতি,নৈতিক অবনতির উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা হয়েছে। 'ভারত উদ্ধার' প্রবন্ধে তিনি বক্তৃতা সর্বস্ব ভণ্ড নেতাদের কটাক্ষ করে বলেছেন --'চিঞরি ভারত উদ্ধার,বাখরি ভারত উদ্ধার, লেব লেবাই ভারত উদ্ধার,ফুচফুচাই ভারত উদ্ধার ,উচপিচাই ভারত উদ্ধার নহয় নহয় নহয়।'

কমলাকান্তের দপ্তরের মতোই বেজবরুয়ার হাসি এবং ব্যঙ্গের অন্তরালে জাতিগত অপমান,লাঞ্ছনার জ্বালা এবং বেদনার অশ্রু লুকিয়ে রয়েছে। আমাদের জাতীয় চরিত্রের নানা দুর্বলতা,বিবিধ সামাজিক ত্রুটি এবং অসমিয়াদের পরানুকরণ স্পৃহার চিত্র তিনি হ্যস্যরসের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরেজ স্ত্রোত্র ,বাবুর উপাখ্যানে বিদ্রূপাত্মক হাস্যরস প্রোজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। ইংরেজ স্তোত্রের নমুনা হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে আমরা উদ্ধৃত করতে পারি --'হে ভক্ত-বৎসল ,আমি তোমার পাত্রাবশেষ ভোজন করিতে ইচ্ছা করি,--তোমার করস্পর্শে লোকমণ্ডলে বহুমানাস্পদ হইতে বাসনা করি --তোমার হস্তলিখিত দুই একখানা

পত্র বাক্সমধ্যে রাখিবার স্পর্ধা করি। অতএব হে ইংরেজ ,তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমি তোমাকে প্রণাম করি। ....আমি মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া তোমার ভাষা কহিব । পৈতৃক ধর্ম ছাড়িয়া ব্রাহ্ম-ধর্মাবলম্বন করিব,বাবু নাম ঘুচাইয়া মিস্টার নাম লেখাইব। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমি তোমাকে প্রণাম করি। ' কৃপাবর বরবরুয়া 'ভারত উদ্ধার' প্রবন্ধে বলেছেন --'উন্নত হবলৈ হলে আমি চব বিলাতী ঢং লব লাগিব,বিলাতী খানা খাব লাগিব,বিলাতী সংস্কৃতি লব লাগিব ইত্যাদি।' কিছু কিছু প্রবন্ধে 'লোক রহস্য' এর প্রভাব রয়েছে। প্রবন্ধগুলিতে রূপ আছে,রঙ আছে,প্রেম আছে এবং গভীর তত্ত্ব কথাও রয়েছে। জীবনের বিভিন্ন স্তরে আমরা এই প্রবন্ধগুলো পাঠ করে বিমল আনন্দ লাভ করতে পারি।

১৮৮২ সনে প্রকাশিত 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে বর্ণিত অপূর্ব জাতীয়তা বোধ এবং দেশপ্রেম কলকাতায় পড়তে আসা ছাত্রদের মনে এক অপূর্ব উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। বন্দেমাতরম মন্ত্র কেবলমাত্র যে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যেই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল তা নয়,অসমের গ্রামেগঞ্জের সাধারণ মানুষের মধ্যেও বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল। অসমের প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী মহেন্দ্রনাথ হাজরিকা তাঁর 'বিয়াল্লিশের বিপ্লব' গ্রন্থে লিখেছেন--'শান্তি সেনা বাহিনির সভ্যরা যেখানেই যেতেন তাঁদের মুখে থাকত 'বন্দেমাতরম' শ্লোগান। সশস্ত্র পুলিশের অত্যাচারকে উপেক্ষা করে গ্রামে গঞ্জের মহিলারাও 'বন্দেমাতরম ' শ্লোগানে আকাশ বাতাস মুখরিত করে পুরুষের সঙ্গে সমানতালে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন। অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরী রচিত 'ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের ভূমিকা' ১৯৫৮ সনে প্রকাশিত হয়। তিনি লিখেছেন --'বঙ্গ থেকে আগত দেশ-সেবার সংগ্রামমুখী সাংগীতিক প্রভাব আমাদের কয়েকজনকে উতলা করে তুলেছিল। ' তিনি আরও লিখেন --' বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম'কে বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের সময় থেকে বঙ্গে এবং লক্ষ্মীনাথের 'অ' মোর আপোনার দেশ'কে অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে অসমীয়া জনসাধারণ জাতীয় সঙ্গীতরূপে গ্রহণ করে। ' বন্দেমাতরম সঙ্গীত কখন থেকে এবং কীভাবে অসমিয়ার চেতনায় সুস্পষ্ট ছাপ রাখে তার কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। খুব সম্ভব বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন যখন উত্তাল রূপ লাভ করেছিল সেই সময় কলকাতায় পড়াশোনা করা অসমিয়া ছাত্র অথবা অসমে বসবাস করা বাঙ্গালি বা অসমে আসা আন্দোলনকারীরা প্রথম 'বন্দেমাতরমের বীজ অসমের মাটিতে রোপণ করে।

লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার 'কৃপাবর বরবরুয়ার ওভতনি' প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট 'বন্দেমাতরম' শীর্ষক লেখাটিতে আমরা বঙ্কিমচন্দ্র রচিত গীতটির প্রয়োগ বা অপপ্রয়োগ সম্পর্কে একটা ব্যঙ্গাত্মক বিবরণ পাই। কৃপাবরের মতে 'বেঁকাচন্দ্র অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরমকে বাঙালিরা যদিও বীজমন্ত্র করেছে ,তাঁরা তার সম্মান রক্ষায় যত্নবান না হয়ে যেখানে সেখানে তাঁর অপপ্রয়োগ করে থাকে। কৃপাবর বরবরুয়া তাঁর প্রবন্ধে 'বন্দেমাতরম পান' এর কলকাতার রাস্তা ঘাটে বিক্রির কথা বলেন। পানওলা বিক্রির সুবিধের কথা ভেবে পানের নামকরণ করে 'বন্দেমাতরম ' পান। এর থেকেই আমরা বন্দেমাতরম এর বিপুল জনপ্রিয়তা সম্পর্কে আঁচ করতে পারি। তবে বন্দেমাতরম মন্ত্রের ব্যবহার বা অপব্যবহার সম্পর্কে ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করলেও লক্ষ্মীনাথ নিজের মনে অসমিয়াদের জন্য এরকম একটি প্রেরণাদায়ক বীজমন্ত্রের প্রয়োজন অনুভব করেন। কৃপাবর বরবরুয়া বলেছেন --'বরুয়াই কয় , অসমীয়ারও বন্দেমাতরঙর নিচিনা কিবা এটা মাত উলিয়াই লোৱা উচিত। বন্দেমাতরং সংস্কৃত। আমার দেশর গাঁওলীয়া সোজা মানুহে তার মানে বা মর্ম ভু না পায় আরু সিঁহতে তাক সিহঁতর মনর তপত ভাপ দি সিজাব পরাটোরো আগন্তুক নাই। যি দেশত যি মন্ত্র বা মাত খাটে ,সেই দেশর মন্ত্র বা মত তেনে হোৱা উচিত। ' এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে কৃপাবর বরবরুয়ার কাঙ্খিত ধ্বনিটি অসমিয়া জনগণ লক্ষ্মীনাথের 'অসম সঙ্গীত' থেকেই সংগ্রহ করে। ধ্বনিটি আমাদের পরিচিত --'জয় আই অসম'।

'বন্দেমাতরম' মন্ত্রকে বেজবরুয়া অসমিয়াদের জন্য উপযুক্ত না ভাবলেও অসমের রাজনৈতিক জীবনে বন্দেমাতরম দ্রুত স্থান করে নেয়। প্রাদেশিকতার গণ্ডিকে অতিক্রম করে 'বন্দেমাতরম' খুব শীঘ্রই সর্বভারতীয় স্বীকৃতি লাভ করে। কুড়ি শতকের তৃতীয় দশকের শুরু থেকেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সঙ্গে অসমিয়া সমাজের অগ্রণী অংশটির সংযোগ গড়ে গড়ে উঠতে থাকে। সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক প্রভাব এবং প্রেরণার ফলে অসমে 'বন্দেমাতরম' এর জনপ্রিয়তা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৩০ সনের ২৬ জানুয়ারির দিনটি সর্বভারতীয় স্ত রে স্বাধীনতা দিবস হিসেবে উদযাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই উপলক্ষে গুয়াহাটি জুবিলি ফিল্ডে তরুণরাম ফুকন ত্রিরঙ্গা পতাকা উত্তোলন করে। অনুষ্ঠানের শেষে 'বন্দেমাতরম' গান গাওয়া হয়।

১৯৩৮ সনে সৈয়দ সাদুল্লার নেতৃত্বে অসমে অ-কংগ্রেসি সরকার গঠিত হয়। পরের বছর সাদুল্লা পদত্যাগ করে। বিরোধী শিবিরের নেতা গোপীনাথ বরদলৈ সাদুল্লার গণতান্ত্রিক মনোভাবের প্রশংসা করে। স্পীকার বিধান সভা ভঙ্গ করার পরে

‘বন্দেমাতরম’ ধ্বনি দেওয়া হয়।

অসম সংস্কৃতির প্রাণপুরুষ ,স্বাধীনতার অক্লান্ত সৈনিক জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালের বেশ কিছু লেখায় আমরা ‘বন্দেমাতরম’এর উল্লেখ পাই। ‘লভিতা’ নাটকের প্রথম দৃশ্যেই স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্দীপিত ভলান্টিয়ারের মুখে আমরা শুনি ‘বন্দেমাতরম’ ধ্বনি। একই দৃশ্যে নেপথ্য থেকে আগত গণ্ডগোলের এবং পুলিশের গুলি চালনার শব্দের সঙ্গে আমরা ‘বন্দেমাতরম’ ধ্বনি শুনতে পাই। জ্যোতিপ্রসাদের অপর একটি দেশাত্মবোধক গানে আমরা পাই --

‘দলে দলে যত ডেকা
আহা আজি রণলৈ
শংকা নকরা শংকা নকরা
ধর্ম যুঁজর হব হে জয়।
বোলা সকলো ভারতীয় মন্ত্র ‘‘বন্দেমাতরম’
গোপ্রা একেলগে মিলি ‘জয় স্বতন্ত্র ভারতম’।

অতুলচন্দ্র হাজরিকার ‘আহূতি’নাটকে গান্ধীর মৃত্যুতে বন্দেমাতরতম গান গাওয়া হয়। শ্রীহাজরিকা তাঁর ‘পনেরো আগস্ট’ শীর্ষক কবিতাটিও বন্দেমাতরম কে অবলম্বন করে রচনা করেন। ১৯৬২ সনে চিন ভারত আক্রমণ করতে উদ্যত হলে শ্রী হাজরিকা ‘বন্দেমাতরম’ শীর্ষক একটি কবিতা রচনা করেন।

বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ অসমিয়া সাহিত্যে চিরকালই প্রাধান্য লাভ করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নন। ১৯৫০ সনে বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কৃষ্ণকান্তের উইল ’অসমিয়া ভাষায় অনূদিত হয়। অনুবাদক শঙ্খনাথ ভট্টাচার্য। বইটি সম্পাদনা করেন বিধুভূষণ চৌধুরী। প্রকাশক শিলঙের চপলা বুকস্টল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বাংলা বইয়ের অসমিয়া অনুবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে চপলা বুক স্টক একসময় বেশ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ২০০০ সনে নিশিপ্রভা ভূঞা ‘সীতারাম’ অনুবাদ করেন। ২০০৮ সনে নিশিপ্রভা ভূঞার অনুবাদে প্রকাশিত হয় ‘আনন্দমঠ’।

এভাবেই বঙ্কিমচন্দ্র আজও অসমের জাতীয় জীবনে একটি শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। পরাধীন ভারতবর্ষে ‘বন্দেমাতরম ’ ধ্বনি যে অপূর্ব জাতীয়তা বোধে সর্বস্তরের মানুষকে এক পতাকাতলে নিয়ে এসে জাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল ,আজও হয়তো কান পাতলে তার প্রতিধ্বনি অসমের আকাশে বাতাসে শোনা যাবে।

বাসুদেব দাস
আশীর্বাদ অ্যাপার্টমেন্ট,১০ নং যশোহর রোড,
সেন্ট্রাল জেল বাস স্টপের বিপরীতে ,
ফ্ল্যাট নং -৪জি,৪র্থ ফ্লোর,কলকতা --৭০০০২৮
৯৭৪৮৪২১৩৪১(মোবাইল)
basudev.das08@gmail.com